বিরাম চিহ্ন

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. বিরাম চিহ্নের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।

২. বিরাম চিহ্নের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

পাঠ

বিরাম শব্দের অর্থ বিন্যাস, যতি, বিরতি বা থেমে যাওয়া। আমরা সব সময় নানা প্রয়োজনে কথা বলি। কিন্তু আমরা অনবরত কথা বলে যাই না। এভাবে কথা বলা সম্ভবও নয়। সে জন্য কথা বলার সময় মাঝে মাঝে থামতে হয়। কখনো আমরা অল্পক্ষণের জন্য থামি, আবার একটু বেশি পরিমাণও থামি। কথা বলে আমরা আমাদের মনোভাব অন্যকে বোঝাতে চাই। না থামলে কথাগুলো অন্যের বোধগম্য হবে না। যেমন-

তুমি কথা দিয়েছিলে তুমি আমাদের বাড়িতে আসবে কিন্তু তুমি আসনি তুমি আসবে শুনে মা কী যে খুশি হয়েছিলেন তিনি তোমার জন্য কত নাস্তা তৈরি করেছিলেন সেমাই ফিরনি চপ বুটের হালুয়া আরো কত কি সালাম কলেজ কি বন্ধ হয়নি ফাঁক পেলে চলে এসো তুমি তো জানো মা তোমাকে কত স্নেহ করেন কী যে ভালো লাগত তুমি এলে।

– উপরের অংশটি আমাদের কারুর মুখের কথা। কথা হল মুখ থেকে বের হওয়া অর্থগ্রাহ্য ধ্বনিসমূহ। মুখে যখন বলি তখন আমরা একটানা গড় গড় করে বলি না, প্রয়োজন মতো থামি। আবার কণ্ঠের স্বরক্ষেপ করে মনের বিচিত্র ভাবও প্রকাশ করি। কখনো প্রশ্ন করি, কখনো বিস্ময় প্রকাশ করি। এভাবে শ্রোতা আমাদের মনোভাব বুঝতে পারে। বক্তা ও শ্রোতার ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সমাজের মানুষের ভাষা তৈরি হয়। মুখের ভাষার লেখ্য রূপও অর্থগ্রাহ্য হবে। সে জন্য বলার সময় আমরা যেভাবে থামি বা স্বরক্ষেপ দিই সেইরকম করে লেখার ভাষাতেও সেগুলো দিতে হয়। এগুলো হল কিছু চিহ্ন, যেমন- দাঁড়ি (।), কমা(,), সেমিকোলন (;), প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?), বিস্ময় বোধক চিহ্ন (!) ইত্যাদি। এগুলোকেই বিরাম চিহ্ন বা যতি চিহ্ন বলা হয়।

আগের গদ্য অংশটিতে কোথায়ও বিরাম চিহ্ন নেই। ফলে ঐ অংশটি পড়া মুশকিল। বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করলেই অংশটি পড়ুয়ার কাছে পূর্ণভাবে স্পষ্ট হবে। –

তুমি কথা দিয়েছিলে তুমি আমাদের বাড়িতে আসবে, কিন্তু তুমি আসনি। তুমি আসবে শুনে মা কী যে খুশি হয়েছিলেন। তিনি তোমার জন্য কত নাস্তা তৈরি করেছিলেন। সেমাই, ফিরনি, চপ, বুটের হালুয়া, আরো কত কি। সালাম, কলেজ কি বন্ধ হয় নি? ফাঁক পেলে চলে এসো। তুমি তো জানো, মা তোমাকে কত স্নেহ করেন। কী যে ভালো লাগত তুমি এলে।

দেখুন, দাঁড়ি (।), কমা (,) ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার করার কারণে অংশটি আমাদের কাছে কেমন স্বচ্ছ হয়ে গেল। সুতরাং বাক্যের অর্থগ্রাহ্যতার জন্য বিরাম চিহ্ন ব্যবহার আবশ্যিক। এটি বাংলা লেখনরীতির অনিবার্য নিয়ম।

বিরাম চিহ্নের সংজ্ঞা

অর্থগ্রাহ্যতা বা জিজ্ঞাসা, বিস্ময় ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে যে সব বিরতি চিহ্ন বা মনোভাব জ্ঞাপন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে বিরাম চিহ্ন বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিরাম চিহ্ন কোনগুলো? বিরাম চিহ্ন কেন ব্যবহার করা হয়?

২. বিরাম চিহ্নের সংজ্ঞা লিখুন।

৩. মুখের ভাষার লেখ্যরূপ কীভাবে অর্থগ্রাহ্য হয়?

পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

২. বিরাম চিহ্ন প্রয়োগের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

পাঠ

লেখার ভাষা মুখের ভাষার প্রতিরূপ। আগে বলা হয়েছে যে, আমরা হড়্হড় করে বলি না, প্রয়োজন মতো থামি। হড়্হড় করে কথা বলতে থাকলে দম ফুরিয়ে যায়। তখন নতুন দম নিয়ে কথা চালিয়ে যেতে হয়। এর থেকে বুঝতে পারি আমাদের কথা বলার রীতি নিয়মের সঙ্গে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস জড়িত। আমরা ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস নিই, আবার শ্বাস ফেলেও দিই। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়েই আমাদের কথা বলার ধরন গড়ে উঠেছে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা মনে রেখে লিখিত ভাষায় দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি বিরাম চিহ্ন বা যতি চিহ্ন প্রয়োগ করতে হয়।

সুতরাং এ কথা বলা যেতে পারে যে, শ্বাস যতির কারণে লিখিত ভাষায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছে।

এই দৃষ্টান্তটি লক্ষ্য করুন-

পথে যেতে যেতে আমি এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে, আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিল না।

এই বাক্যে একটি মাত্র কমা দিতে হয়েছে বিরতি বোঝানোর জন্য। এই বিরাম চিহ্ন শ্বাস যতি নির্দেশ করে।

কিন্তু শ্বাস যতি বোঝানো বিরাম চিহ্নের প্রধান কাজ নয়। বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রধান লক্ষ্য বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন করা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে শ্বাস যতির চেয়ে অর্থ যতির গুরুত্ব বেশি। লিখিত ভাষাকে বিরাম চিহ্ন দিয়ে বিভক্ত করলেই কেবল ভাষা সুবোধ্য হয়ে ওঠে এবং বাক্য অর্থ সংগতি লাভ করে। তখন বাক্য পড়তে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না এবং বক্তব্য সহজে আমরা বুঝে ফেলি। প্রকৃতপক্ষে, লিখিত ভাষার অর্থ বোঝার জন্য ঠিক ঠিক বিরাম চিহ্ন ব্যবহার খুবই দরকারি। নিচের দৃষ্টান্তটি লক্ষ্য করুন :

গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু সাজসজ্জার অভাবে মেয়েটিকে তেমন দেখায় না। মেয়েটির অলঙ্কার নেই, প্রসাধন নেই, ভালো শাড়িও নেই। একবার এক পাত্রের ধনী বাবা মেয়েটিকে দেখতে এলেন। তখন মেয়ের মা আর কী করবেন। তাকে তাঁর পুরোনো একখানা কাপড় পরিয়ে দিলেন, চুল আঁচড়ে বেনী করে দিলেন, আর কপালে দিলেন ছোট্ট একটি টিপ, তাতেই মেয়েটি অপরূপা হয়ে উঠল।

যথোপযুক্ত বিরাম চিহ্ন প্রয়োগের জন্য এই অংশটি চমৎকার অর্থগ্রাহ্য হয়েছে। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই। দাঁড়ি, কমা ব্যবহারের এই হল গুরুত্ব। ঠিক জায়গায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত না হলে বাক্য পড়তেও অসুবিধা, সুতরাং এই কথা বলা যেতে পারে যে,

বিরাম চিহ্ন বা যতিচিহ্ন ব্যবহারের প্রধান কাজ ভাষার বা বাক্যের অর্থগ্রাহ্যতা সৃষ্টি করা।

☞

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূল প্রশ্ন

১. বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অল্প কিছু লিখুন।

২. শ্বাস যতি ও অর্থযতি বুঝিয়ে দিন। বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রধান কাজ কোনটি?

পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের ইতিহাস জানতে পারবেন।

পাঠ

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এক হাজার বছরের কিছু বেশি। কিন্তু বাংলা ভাষায় সুষ্ঠুভাবে বিরামচিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়েছে দেড়শ দুইশ বছর আগে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্য ভাষার ব্যাপক ব্যবহারের সূত্রে বিরাম চিহ্ন প্রয়োগের নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য কবিতায় লেখা। কবিতাতে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের তেমন আয়োজনও ছিল না, বিরাম চিহ্নের তত বেশি প্রয়োজনও হত না। কবিতার প্রতি চরণের মধ্যখানে একটি কমা (,), চরণের শেষে একটি দাঁড়ি (।) দেওয়া বিধেয় ছিল। পরের চরণের শেষে দুই দাঁড়ি (॥) দিতে হত। যেমন-

> অতি বড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ
> কোন গুণ নাই তার, কপালে আগুন।

বাংলা ভাষার মধ্যযুগের শেষ হয় আঠার শতকে। উনিশ শতকে গদ্যের উদ্ভব হয়েছে। গদ্য কাজের ভাষা। জীবনের নানা প্রয়োজনে তখন থেকে গদ্যের ব্যবহার হচ্ছে। গদ্যের জন্য বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের গুরুতর প্রয়োজন দেখা দিল। বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক লিখিত রূপ প্রথম পাওয়া গেল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলোতে। কয়েকজন ভালো গদ্য লেখকেরও দেখা পাওয়া গেল। যেমন রাম রাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এঁদের পর রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ গদ্য লেখকদের আবির্ভাব ঘটলো। কিন্তু এঁরা কেউ বিরাম চিহ্ন সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারলেন না। তবে এঁদের কাছাকাছি সময়ের স্মরণীয় লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের নৈপুণ্য দেখালেন। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলেছেন। আসলে 'বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি গদ্য লেখার নিয়মকানুন আবিষ্কার করেন। গদ্য পদ্যের মতো ছন্দোবদ্ধ রচনা নয়, কিন্তু গদ্যেরও ছন্দ আছে। বিরামচিহ্ন ঠিকভাবে ব্যবহার করে বিদ্যাসাগর গদ্যের ছন্দ বুঝিয়ে দিলেন। আর গদ্যভাষাকে সুস্পষ্ট করার পথও তিনি দেখিয়ে দিলেন। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি তিনি এমনভাবে ব্যবহার করলেন যাতে গদ্য পড়তে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়। বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তি বিলাস ইত্যাদি তাঁর রচনা। এই রচনাগুলোর গদ্যভাষা খুব সুন্দর, তবে এই ভাষা আরো সুন্দর হয়েছে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের গুণে।

বিদ্যাসাগর ইংরেজি রচনারীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজি গদ্যের বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের অনুসরণে তিনি বাংলা গদ্যে এগুলো ব্যবহার করেন। বিদ্যাসাগরের পরে বাংলা সাহিত্যে আরও বড় বড় গদ্য লেখকের জন্ম হয়েছে। যেমন- বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ। এঁদের হাতে বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম-কানুন আরো সুদৃঢ় যেমন হয়েছে, তেমনি বিচিত্রও হয়েছে। বাংলা লিখিত ভাষায় এখন বিরাম চিহ্ন নিয়ে কেউ ভাবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আমলে এ নিয়ে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২. বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের অবদান বর্ণনা করুন।

৩. বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিল কোন সময় থেকে? এ সম্পর্কে লিখুন।

পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

বিরাম চিহ্ন ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

ভূমিকা

বিভিন্ন বিরাম চিহ্নের সঠিক ব্যবহার নির্ভর করে এর প্রয়োগের চর্চার উপর। তাই নিচের ব্যবহার বিধি যেমন জানতে হবে তেমনি নিজে নিজে তা চর্চা করতে হবে।

১. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।)

বাক্যের বক্তব্য শেষ হলে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ বসে। যেমন- করিম পড়ে।

(ক) বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি।

(খ) পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

(গ) আমার মায়ের মতো আর কেউ নেই।

(ঘ) জহির ফুটবল খেলে।

(ঙ) অভি গান গায়।

২. কমা [,]

বাক্যের মধ্যে স্বল্পতম সময়ের বিরতির জন্য কমা [,] ব্যবহার করা হয়। যেমন-

(ক) বাক্যে একই পদের একাধিক শব্দ থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন- রিমু, ঝিমু, এষা সবাই কলেজে গেছে।

(খ) সে, তুমি, আমি, তিনজনেই যাব।

(গ) ঢাকা গেলাম, ঘুরলাম, দেখলাম, ফিরে এলাম।

(ঘ) বলেছি, বকেছি, এখন হাল ছেড়ে।

(ঙ) অমিত, আমার কলমটা নিয়ে এসো।

(চ) হেড মাস্টার বললেন, "তোমার এ ফলাফল আশা করিনি।"

(ছ) ডাঃ ওয়াহিদ রহমান, এম,বি,বি,এস।

৩. সেমিকোলন [;]

কমার চেয়ে একটু বেশি ও দাঁড়ির চেয়ে কম থামতে হলে সেমিকোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমন -

(ক) লোকটি ভাল; তবে একগুয়ে স্বভাবের।

(খ) এবার বর্ষা হয়েছে সময়মত; তাই ফসল হবে ভাল।

(গ) নিষ্ঠাবান শিক্ষকের অভাব; সবাই শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করছে।

(ঘ) আগে চাই মাতৃভাষার পত্তন; পরে ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা।

৪. কোলন ও কোলন ড্যাশ [:] [: -]

সাধারণত উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্ত বোঝানোর জন্য কোলনের ব্যবহার হয়। যেমন-

(ক) মেলায় দারুণ ভিড় : পুতুল নাচের রমরমা ব্যবসা

(খ) কারক ছয় প্রকার। যথা : - কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

৫. জিজ্ঞাসা চিহ্ন [?]

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বুঝালে জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন [?] বসে। যেমন-

(ক) তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়?

(খ) একি সেই ডাকাত? যাকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে?

বিস্ময়সূচক বাক্যের পরেও জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে। যেমন - একি! এক ঝুড়ি আম সকাল থেকে সাবাড় করে ফেলেছে?

৬. বিস্ময়সূচক চিহ্ন [!]

আনন্দ, বিষাদ, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা বুঝাতে বাক্যের শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে।

(ক) ও! মরি! মরি! কি সুন্দর দৃশ্য!

(খ) হায়! আমার দুঃখ ভরা কপাল।

৭. ড্যাস [-]

দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ও গতি সঞ্চারে [-] ব্যবহৃত হয়। যেমন -

(ক) "চল তোকে ফেলে রেখে আসি - কাপুরুষ।

(খ) লোকটির চারটি ছেলে - সবগুলো গুণধর, কেউ লেখাপড়া করে না।

উদাহরণ দিতে গিয়ে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার হয়। যেমন- সমাস ছয় প্রকার- দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

৮. লোপ চিহ্ন [']

শব্দ বা পদের মধ্যস্থ কোন অক্ষর লোপ পেলে লোপচিহ্ন বসে। যেমন-

(ক) যাব 'খন

(খ) দু'বেলা ভাতই জোটেনা।

(গ) রামে'র ভাই লক্ষণ।

৯. উদ্ধৃতি চিহ্ন [" "]

বক্তার বক্তব্য তুলে ধরতে হলে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার হয়। যেমন-

(ক) ভাগিনা বলিল, "মহারাজ পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।"

(খ) অন্য রচনা থেকে উদ্ধৃত করতে চাইলে-

"যাহা পাই তাহা ভুল করে চাই" – রবীন্দ্রনাথ

১০. হাইফেন [-]

দুই বা তার চেয়ে বেশি পদের মধ্যে সংযোগ বা সমাস বোঝাতে হাইফেন [–] ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(ক) ঘরে-ঘরে জ্বর-জ্বালাতন লেগেই আছে।

(খ) কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী দেখেছি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন-

ক. কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে।

খ. বাংলা ভাষায় বিস্ময়বোধক চিহ্নের ব্যবহার নেই।

গ. বাক্যে গতি সঞ্চারের জন্য ড্যাশ ব্যবহৃত হয়।

ঘ. অন্যের রচনা উদ্ধৃত করলে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা বিধেয়।

ঙ. প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বোঝালে শেষে জিজ্ঞাসা বোধক (?) চিহ্ন বসে।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর : ক. মিথ্যা খ. মিথ্যা গ. সত্য ঘ. সত্য ঙ. সত্য

২। বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করুন।

ক. আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলো খটখট শব্দ করিয়া পড়িত দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় পাড়িতে হইত।

খ. যে ভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল এবং যেভাবে বিপন্ন মুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরু মশায়ের কাছে যাইতেছিল তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।